সোশ্যাল মিডিয়ার ২০০০ বছর

বিপ্লব মাজী

যিশুর জন্মের ৫১ বছর আগে বিশিষ্ট রোমান রাজনীতিক ও সুবাগ্মী মারকাস তুল্লিয়াস সিসেরো রিজিওনাল গর্ভনর হয়ে সিলিসিয়া (বর্তমানে তুরস্কের দক্ষিণ পূর্বে) পৌঁছোলেন। কিন্তু তাঁর মন খারাপ। রোম হল ক্ষমতার কেন্দ্র। সেখানেই যত রাজনীতির উত্থানপতনের দাবার ঘুঁটি চালা হয়। রোমান রাজনীতির কেন্দ্র থেকে গভর্নর পদ দিয়ে তাঁকে সরিয়ে দেওয়া হয়েছ। অনিচ্ছা সত্ত্বেও পদটি নিতে তিনি বাধ্য হয়েছেন। যেভাবেই হোক রোমে তাঁকে ফিরতে হবে। সবচেয়ে বেশি যে প্রশ্নটা তাঁকে ভাবাচ্ছিল, জুলিয়াস সিজার তখন পশ্চিমে রোমান সেনাবাহিনীর কমান্ডার, সেনাবাহিনী নিয়ে রোমে অভিযান চালিয়ে শহরের দখল নিয়ে নিতে পারেন। সিসেরো সব সময়েই রোমান রিপাবলিকের রাজনৈতিক ব্যবস্থাকে সমর্থন করে এসেছেন, ক্ষমতার বিকেন্দ্রীকরণে তাঁর সায় সবসময়েই স্পষ্ট, যে কোনো ব্যক্তির রোমের একনায়ক হওয়ার তিনি বিরোধী। জুলিয়াস সিজার ও সিজারের মতো কয়েকজনকে সিসেরোর ভয়, তারা না হঠাৎ ক্ষমতার কেন্দ্রীকরণ করে বসে। কিন্তু দুর্নীতি বিরোধী আইনকে কার্যকরী করার জন্য, তাঁর মতো বিশ্বাসযোগ্য নিতে হয়েছে। কিন্তু রোম থেকে দূরে সিসিলিয়া-তে থেকে সিসিরো রোমে প্রতিদিন কী ঘটে চলেছে তাঁর নিজস্ব উপায়ে সে সংবাদ রাখতেন। সেই প্রায় ২০০০ বছর আগে রোমের এলিটরা সংবাদ আদানপ্রদানের একটা সিস্টেম গড়ে তুলেছিলেন, যা ছিল বর্তমানের ইনফরমেশন টেকনোলজির মতো একটা মাধ্যম।

আজ থেকে ২০০০ বছর আগে কোনো প্রিন্টিং প্রেস বা সংবাদপত্র ছিল না। সংবাদ আদান প্রদান চলত চিঠিপত্রের মাধ্যমে, বা কোনো তথ্য হাতে লিখে, একের পর এক কপি করে, মন্তব্য করে, প্যাপিরাসের রোলের মধ্যে পাঠিয়ে রোমান এলিটরা পারস্পরিক মতামত বিনিময় করতেন। অর্থাৎ কে কি ভাবছেন পরস্পরের মধ্যে শেয়ার করতেন। সিসেরোর অসংখ্য চিঠির যে সংগ্রহ পাওয়া গেছে, তার থেকে জানা যায় তিনি নিয়মিত রোমান এলিটদের সঙ্গে রাজনৈতিক মতামত বিনিময় করতেন, সব সময় তাঁদের তাজা খবর দিয়ে প্রায়ই একটি চিঠির অনেকগুলি হাতে লেখা কপি করা হত। বিলি করা হত, এবং বিভিন্ন মন্তব্য বা মতামত পুনর্লিখনে শেয়ার করা হত, ঠিক আজকাল আমরা যেমন ফেসবুক, টুইটার, হোয়াটস অ্যাপ বা ইউটিউবে মতামত শেয়ার করি, একটি কেন্দ্র থেকে অসংখ্য কেন্দ্রে এবং সেইসব কেন্দ্র থেকে পারস্পরিক মতামত ছড়িয়ে পড়তে থাকে, যতক্ষণ লাইক বা শেয়ার করা চলতে থাকে। অনেক ক্ষেত্রে নিজেদের আড্ডার পরিসরে চিঠিগুলি তারা জোরে জোরে পড়ে শোনাতেন। যার সাহায্যে সাধারণ মানুষও রোমান রাজনীতিকদের মতামত পাবলকি স্ফিয়ারে (পরিসরে) জেনে যেতেন।

যখন সিসেরো বা অন্য কোনো রাজনীতিক মূল্যবান কোনো বক্তৃতা দিতেন, বক্তৃতার কয়েকটি লিখিত কপি তাঁরা জনসমাবেশে ছড়িয়ে দিতেন। যাঁরা সেগুলো পেতেন তাঁরা আবার কপি করে তাঁদের বন্ধুদের মধ্যে ছড়িয়ে দিতেন, ফলে আজকালের ফেসবুক শেয়ার রাজনীতিকদের রোমের কোনো বিষয় সম্পর্কে বক্তব্য সাধারণ মানুষের মধ্যে ছড়িয়ে পড়ত। একইভাবে হাতে লেখা প্যাপিরাসে রোল করা বই জনসাধারণের হাতে ঘুরে ঘুরে অসংখ্য হাতে চলে যেত। রোমের বিভিন্ন ফোরামে যেখানে জনসমাবেশ হয়, হাতে লেখা সরকারি গেজেট দেয়ালে দেয়ালে সেঁটে দেওয়া হত, প্রতিদিন সেই গেজেট বের হত, যাঁরা প্রয়োজন মনে করতেন সেখানে থেকে প্রয়োজনীয় সংবাদ লিখে নিতেন। গোটা ব্যাপারটা সংগঠিত হত আজকের স্যোশাল মিডিয়ার মতোই। এইসব গেজেটে রাজনৈতিক বিতর্ক, নতুন নতুন আইন করা নিয়ে নানা প্রস্তাব, জন্ম ও মৃত্যুর ঘোষণা, সরকারি ছুটির দিন ও অন্যান্য সরকারি সংবাদ থাকত। যেহেতু দূর সিলিসিয়াতে সিসেরোকে চলে যেতে হয়েছিল, তিনি তাঁর আশ্রিত মার্কাস সাইলিয়াস রুফাস (Marcus Caelius Rufus)-কে প্রতিদিন রোম থেকে গেজেট প্রকাশিত সংবাদ পাঠাতে বলতেন, ফলে রোম থেকে দূরে নিয়ে যেতেন। অন্যান্য বন্ধুদের চিঠি, সাক্ষাৎকার ও নানা রটনা থেকেও সিসেরো রোমের সংবাদ সংগ্রহ করতেন। রোমের যে কোনো সংবাদ এক সপ্তার মধ্যে তাঁর কাছে পৌঁছে যেত। সেই সময় রোম থেকে পশ্চিমে ব্রিটেনে কোনো সংবাদ পৌঁছোত পাঁচ হপ্তায়, পূর্বে সিরিয়া পৌঁছোতে লাগত সাত হপ্তা। ব্যবসা বাণিজ্য করত যে বণিকরা সৈন্যরা, আমলারা নিত্যদিন রোমের বিভিন্ন সংবাদ রোম সাম্রাজ্যের বিভিন্ন অঞ্চলে পৌঁছে দিত। যেহেতু কোনো পোস্ট অফিস ছিল না। চিঠিপত্রের আদান প্রদান করত বার্তাবাহকরা, ভ্রমণকারীরা, বেড়াতে বেরোনো কোনো বন্ধু। ফলে সেই ২০০০ বছর আগে সিসেরো ও রোমের রাজনীতিকরা পরস্পরের মত বিনিময়ের জন্য আন্তর্জাল সৃষ্টি করেছিলেন, যার মাধ্যমে পরস্পরের সঙ্গে যোগাযোগ রাখতেন।

রোম সাম্রাজ্যে সিসেরোর মতো রাজনীতিকরা যে যোগাযোগ ব্যবস্থা গড়ে তুলেছিলেন,তা আমাদের আধুনিক চোখে ইন্টারনেটের সমগোত্রীয়। বর্তমানে সমাজের বিভিন্ন পেশার মানুষদের নানা সার্কেল বা সমাজ ছিল। যে যার বৃত্তে খবর আদান প্রদান করত। ফলে রোম সাম্রাজ্যের প্রান্তিক অঞ্চলের ঘটনা যেমন দ্রুত রোমে পৌঁছে যেত, রোমে রাজনীতি কোনদিকে মোড় নিচ্ছে সোশ্যাল মিডিয়ার মাধ্যমে সাম্রাজ্যের দূরবর্তী অঞ্চলের এলিটদের কাছে পৌঁছে যেত। রোম সাম্রাজ্যকে সময়ের চেয়ে আজ অনেক দ্রুত ফেসবুক, টুইটার, ব্লগে বা ইন্টারনেটের অন্যান্য মাধ্যমে ব্যবহার করে কাজ সেরে নিতে পারি। কিন্তু অতীতের ব্যবস্থাটা শ্লথগতি সম্পন্ন হলেও, প্রায় একই ব্যবস্থা ছিল। অতীতের প্রযুক্তির চেয়ে বর্তমানের প্রযুক্তি অনেক উন্নত, একথা মনে রাখতে হবে সিসেরোর আন্তর্জাল ব্যবস্থার জগৎ থেকে ইতিমধ্যে আমরা প্রায় ২০০০ বছর পেছনে ফেলে এসেছি। কোনো সংবাদ হয় কথার মাধ্যমে সমান্তরালভাবে শ্রোতাদের কাছে পৌঁছাবে, বা কোনো একটি উৎস থেকে পাঠক/শ্রোতাদের

কাছে পৌঁছে যাবে। বর্তমানে দেখছি, তা শুধু সিসেরো না, সমাজের অন্যান্য এলিটরাও অতীতে ব্যবহার করতেন।

প্রাচীনকালে খ্রিস্টান চার্চগুলিও চিঠি ও অন্যান্য তথ্য, দলিল একই আন্তর্জাল পদ্ধতিতে এক চার্চ থেকে অন্য চার্চে পাঠাতেন। ষোলো শতকে জার্মানিতে যখন মুদ্রণ যন্ত্র আবিষ্কার হয়ে গেল, রিফরমেশনের সময় হাজার হাজার মুদ্রিত ধর্মীয় প্রচারমূলক হ্যান্ডবিল, পুস্তিকা ছাপা হয়ে লক্ষ লক্ষ মানুষের মধ্যে ছড়িয়ে পড়েছিল প্রায় একইরকম আন্তর্জাল পদ্ধতিতে। এই আন্তর্জাল পদ্ধতি মার্টিন লুথারকে সাহায্য করেছিল চার্চের গোঁড়া মনোভাবের বিরুদ্ধে দ্রুত সাধারণ মানুষকে সংগঠিত করতে। হাতে লেখা প্রচারপত্রের চেয়ে মুদ্রিত প্রচারপত্রের ক্ষমতা অনেক বেশি ছিল। ইংল্যান্ডের স্টুয়ার্ট ও টিউডর রাজসভায় হাতে লেখা নানারকম গুজবের আদানপ্রদান হত। রাজ পরিবারের সমর্থক অভিজাত এলিটদের সঙ্গে পার্লামেন্টের বাগবিতণ্ডা নানা প্রচারপত্রের মাধ্যমে জনসাধারণের মধ্যে ছড়িয়ে পড়ত। কোনদিকে? জনসাধারণের মতামতকে গুরুত্ব দেওয়া হত। ইংরেজদের গৃহযুদ্ধের সময়ও মধ্যযুগীয় আন্তর্জাল ব্যবস্থা কাজ করত। একের পর এক সংবাদ স্রোতের মতো সর্বত্র ছড়িয়ে পড়ত। আলোকপ্রাপ্ত (Enlightenment) কফি হাউসগুলিকে কেন্দ্র করে রাজনৈতিক তর্ক-বিতর্ক চলত, সংবাদপত্র, প্যামফ্লেট দেওয়া নেওয়া হত। সমাজে পরস্পরের মধ্যে যোগাযোগের পাবলিক স্ফিয়ার গড়ে উঠতে থাকে। বিজ্ঞান নিয়ে আলোচনার পরিসর তৈরি হল। বিজ্ঞানীরা একে অন্যের চিন্তার আদান-প্রদান করার সুযোগ পেলেন। প্রিন্ট মিডিয়া তাঁদের সাহায্য করল। প্যামফ্লেট ও স্থানীয় সংবাদপত্রগুলি গৃহযুদ্ধের দিনগুলিতে আমেরিকার স্বাধীনতার সমর্থক হল, জনমত তৈরি করল। ফরাসি বিপ্লব পূর্ব ফ্রান্সে হাতে লেখা কবিতা, নিউজ লেটার সমগ্র ফ্রান্সে আসন্ন বিপ্লবের গুজব ছড়িয়ে দিল। মানবসভ্যতার ইতিহাসে মাঝে মাঝেই সমাজের প্রয়োজনে সোশ্যাল মিডিয়ার আবির্ভাব ঘটেছে। কেননা সোশ্যাল মিডিয়ার ক্ষমতা অনেক বেশি। নতুন থেকে জন্ম নিয়েছি। সাম্প্রতিককালে যে ধরনের জনজাগরণ আমরা আরব বসন্তে দেখেছি, খোদ মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে ওয়াল স্ট্রিট দখল দেখেছি, গ্রিস, স্পেন, ভারত, থাইল্যান্ড, মায়ানমার, বাংলাদেশ সর্বত্রই দেখছি। সোশ্যাল মিডিয়া ক্রমশই মডার্ন বা পোস্ট মডার্ন পৃথিবীতে শক্তিশালী হাতিয়ার হয়ে উঠছে। রাষ্ট্রনেতারা বাধ্য হচ্ছেন সোশ্যাল মিডিয়াকে গুরুত্ব দিতে।

উনিশ শতকের মাঝামাঝি এসে সবকিছু বদলে গেল। বাষ্পক্ষমতা সম্পন্ন প্রিন্টিং প্রেসে আবিষ্কৃত হল। তারপর বিশ শতকে এল রেডিও, টেলিভিশন। এইসব প্রযুক্তি মানুষের হাতে এসে যাওয়ায় মাস-মিডিয়ার জন্ম হল। এই নতুন প্রযুক্তি দ্রুত ও সক্রিয়ভাবে লক্ষ লক্ষ জনগণকে প্রভাবিত করার ক্ষমতা ধরল। কিন্তু এই অত্যাধুনিক প্রযুক্তি বিশাল খরচ সাপেক্ষ বলে, হাতে গোনা কয়েকজন ব্যক্তি বা শিল্পপতির কুক্ষিগত হল। তারা যে কোনো দেশের রাষ্ট্র ব্যবস্থাকে প্রভাবিত করার অসীম ক্ষমতা ধরল। রাজনীতিকদের প্রভাবিত করল। সোশ্যাল মিডিয়ার সমস্ত হাল, অন্যদিকে রাজনৈতিক ক্ষমতা কেন্দ্রীভূত করল। কিন্তু প্রত্যেক

ক্রিয়ার বিপরীত ও সমান প্রতিক্রিয়া থাকে। রেডিওতে জনগণ যা শুনলেন, বা টেলিভিশনে যা দেখলেন তা যতই কুহক বা অতিবাস্তব সৃষ্টি করুক, ঘটনার সত্যি মিথ্যে যাচাই করার ক্ষমতা লক্ষ লক্ষ মানুষ পেলেন। মানুষের চিন্তার ক্ষমতাকে সাময়িকভাবে দাবিয়ে রাখা যায়। চিরকাল যায় না। ফলে রেডিও, টেলিভিশন সোশ্যাল মিডিয়া হিসেবে জনগণের হাতেরও অস্ত্র হল। যে কোনো ঘটনা শুনে বা দেখে জনগণও নিজের চিন্তার স্বাধীনতা অনুযায়ী সিদ্ধান্ত নিতে পারেন। এইসব প্রযুক্তির কেন্দ্রগুলি যাদের হাতে থাকে। সেইসব পুঁজিপতিরা মুনাফা ও পুঁজির ব্যাপারটা ভালোই বোঝেন। জনমতের হাওয়া বুঝে বহুরূপীর মতো তারা রূপ বদলে ফেলেন তথ্যের বন্যায় বদলে যেতে শুরু করল মানুষের ভাবনা চিন্তা।

আগে সোশ্যাল মিডিয়ার বক্তা ও শ্রোতা, বা খোলা ছিল। কিন্তু রেডিও, টেলিভিশনের ক্ষেত্রে এতটা পথ বন্ধ হয়ে গেল। একটা কেন্দ্র থেকে জনসাধারণের কাছে সংবাদ দ্রুত পৌঁছাতে লাগল। মাঝে মাঝে রিয়ালিটি শো করে মিডিয়া বিতর্কের পথ খোলা রাখলেও, মালিক বা হাউসের মর্জি অনুযায়ী তা পরিবেশিত হয়। মিডিয়া ঠিক করে সে কোন রাজনৈতিক দলকে তোল্লা দেবে, কাকে দেবে না। সোশ্যাল মিডিয়ার পরিসরটা রেডিও, টেলিভিশন নষ্ট করে দিল। কিন্তু সোশ্যাল মিডিয়ার পরিসর বা পাবলিক স্ফিয়ারটা আবার ফিরে এল কমপিউটার তথ্য-প্রযুক্তির কল্যাণে। ইন্টারনেট, ফেসবুক, টুইটার, ইউটিউব মেসেঞ্জার। হোয়াটস অ্যাপ ব্যবহার করে সোশ্যাল মিডিয়া অনেক অনেক বেশি সংখ্যায় রাষ্ট্রের রাজনীতি অর্থনীতি সমাজনীতি ও বিশ্বের রাজনীতি। আন্তর্জাতিক পরিস্থিতি নিয়ে স্বাধীন মতামত ব্যক্ত করতে পারল। যদিও সোশ্যাল মিডিয়াকে কণ্ঠরোধের বিভিন্ন প্রচেষ্টা রাষ্ট্র থেকে শুরু হয়ে গেছে। সোশ্যাল মিডিয়ার চাপ সহ্য করতে না পেরে বিভিন্ন দেশের তথ্য জানার অধিকার তাঁদের অনেক দুর্নীতি ও কুকীর্তি জনগণের সামনে বা পাবলিক স্ফিয়ারে আসছে। বিরোধী দলে থাকলে সোশ্যাল মিডিয়ার সমর্থক, ক্ষমতায় গেলে বিরোধী। মাস-মিডিয়া প্রযুক্তির সাহায্য নিয়ে, বা তাকে কাজে লাগিয়ে স্বৈরাচারী রাষ্ট্রনায়করা অনেক সহজে সরকারের ঢাক পেটার কাজে লাগাচ্ছেন, অনেক সময় তা গোয়েবলসীয় মিথ্যা প্রোপাগান্ডায় পরিণত হচ্ছে। সাধারণ মানুষে বুঝতে পারছেন না কোনটা সত্যি? কোনটা মিথ্যে?

অতীতে সোশ্যাল মিডিয়া সমাজে পাবলিক স্ফিয়ার তৈরির কাজে নিজেকে যে প্রতিষ্ঠিত করত, তার চরিত্রটাই নতুন ইলেক্ট্রনিক প্রযুক্তি বদলে দিয়েছে। অন্যদিকে ইন্টারনেট প্রকাশনার জগতে এমন বৈপ্লবিক পরিবর্তন এনেছে যে, পাবলিক স্ফিয়ারে (জন-পরিসর) সোশ্যাল মিডিয়ার ক্ষমতা অনেক বেশি। প্রকাশনার গণতন্ত্রীকরণ সম্ভব করেছে ফেসবুক, টুইটার, ইউটিউব, মেসেঞ্জার, হোয়াটস-অ্যাপ ইত্যাদি। রাষ্ট্রের রাজনীতি ও সমাজনীতি স্বদেশ রাখার ব্যাপারে সোশ্যাল মিডিয়ার প্রভাব প্রতিপত্তি ও ক্ষমতা আজ সীমাহীন। ডিজিটাল প্রযুক্তি সোশ্যাল মিডিয়ার ক্ষমতা আরো বহুগুণ বাড়িয়ে দিয়েছে। মিডিয়া ও সমাজ— উভয়েই ক্ষেত্রেই।

সোশ্যাল মিডিয়ার এই ২০০০ বছরে, অপরিহার্য ভাবে নানা প্রশ্নও উঠছে। সোশ্যাল মিডিয়ার এই যে নতুন রূপ, জনসাধারণের বিতর্কের পরিসর বা পাবলিক ডিসকোর্সের জায়গাটা নষ্ট করে দিচ্ছে? সোশ্যাল মিডিয়ার রাষ্ট্র বা সমাজ বা রাজনৈতিক দলের বিরুদ্ধে যে সমালোচনার ঝড় উঠে তা ওইসব প্রতিষ্ঠান মেনে নেবে? না মেনে নেবে না? ২০০০ বছরের ইতিহাসের পরম্পরায় সোশ্যাল মিডিয়া ব্যক্তির স্বাধীনতা ও গণতন্ত্রের পরিসরকে বিস্তৃত করছে? যদি কোনো দেশে বিপ্লবের আগুন জ্বলে ওঠে। সোশ্যাল মিডিয়ার ভূমিকা কী হবে? সমাজের অন্যান্য নানা সমস্যা থেকে সোশ্যাল মিডিয়ায় কোনো ব্যক্তি যে সময় ব্যয় করেন, তা কি তিনি অন্য কোনো কাজে লাগাতে পারতেন না? সোশ্যাল মিডিয়ার ব্যবহার কি সমাজ-বিরোধী না? কেননা অনলাইন সংযোগ বাস্তব জগতের মতামত বিনিময়ের ক্ষেত্র থেকে দূরে সরিয়ে নিয়ে যায়, আমরা বোদ্রিয়ার হাইপাররিয়ালিটি বা অতিবাস্তবের জগতে চলে যাই। সোশ্যাল মিডিয়া কি যুক্তিহীন খেয়ালিপনা? যাকে অনায়াসে অবজ্ঞা করা যায়।

একথা মনে রাখা ভালো, সোশ্যাল মিডিয়ার প্রাচীন ফর্মটি কিন্তু পৃথিবীর ইতিহাসে অনেক বিপ্লবে সাহায্য করেছে, অনেক সংস্কার আন্দোলন ঘটিয়েছে এবং আধুনিক ফর্মটি মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের বুকে ওয়াল স্ট্রিট বিক্ষোভ, আফ্রিকার উত্তর উপকূল ও মধ্যপ্রাচ্যে আরব বসন্তর মতো ঘটনা ঘটিয়েছে, দিল্লিতে এক তরুণীকে গণধর্ষণের বিরুদ্ধে গণবিক্ষোভ ঘটিয়েছে, ইউরোপ ও দক্ষিণ-পূর্ব এশিয়াতেও মিডিয়া। প্রাচীনকালে সোশ্যাল মিডিয়া সমাজে যেসব রড়ো বড়ো পরিবর্তন আনতে পেরেছিল, বা সমর্থ হয়েছিল সেরকম বড় কোনো পরিবর্তন আমাদের সময়ের সোশ্যাল মিডিয়া সম্পন্ন করতে পারেনি, কেননা রাষ্ট্রও কমিউনিকেশন সিস্টেমকে হাতিয়ার করে কাউন্টার প্রচারে যায় এবং ক্ষমতাবলে সোশ্যাল নেটওয়ার্ক কী প্রচার করবে, কী প্রচার করবে না—তার নির্দেশিকা জারি করে, তাতে গণতন্ত্রের গলা টিপে ধরা হলে বা মানবাধিকার লঙ্ঘন হলে রাষ্ট্রের কিছু যায় আসে না। অন্যদিকে সোশ্যাল মিডিয়াকে ব্যবহার করে কোনো দেশে প্রতিবিপ্লবও ঘটে যায়, আরব বসন্তের সময় যা আমরা মিশরে দেখলাম এই ডিজিট্যাল প্রযুক্তির যুগে সোশ্যাল মিডিয়ার ভালো ও মন্দ দিক নিয়ে আজ যেসব বিতর্ক উঠছে, সে ক্ষেত্রে বিতর্কে নতুন আলো ফেলার মতো উপাদান আমরা সোশ্যাল মিডিয়ার ২০০০ বছরের ইতিহাস থেকে পেতে পারি। অন্যদিকে সোশ্যাল মিডিয়া নিয়ে আমাদের বর্তমান সময়ের অভিজ্ঞতার দেখতে পারি।

বর্তমানে যাঁরা ইন্টারনেটের সাহায্যে সোশ্যাল মিডিয়া ব্যবহার করেন, সোশ্যাল মিডিয়াকে তাঁরা একুশ শতকের ক্ষমতার হাতিয়ার ভাবেন, কিন্তু এই সোশ্যাল মিডিয়ার যে ২০০০ বছরের একটা ইতিহাস আছে তা অনেকেই জানেন না। ইন্টারনেটের বিভিন্ন তথ্য ফেসবুক, টুইটার, ইউটিউব ও অন্যান্য অ্যাপস-এ আমরা যেভাবে ব্যবহার করছি, শেয়ার করছি তার অনেকটাই পূর্বপুরুষদের কাছ থেকে পাওয়া। ইতিহাসে যার শিকড় আছে।